বাংলাদেশের সিনেমা

ইরাবান বসুরায়

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, তার সিনেমাও স্বতন্ত্র হওয়ারই কথা। তবু এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সিনেমার কথা উঠলে ভারতীয় সিনেমার প্রসঙ্গ এসে যাবেই। বাংলাদেশের সিনেমার পক্ষে ভারতীয় সিনেমার শিকড়ের টান অস্বীকার করা কঠিন। ভারতীয় সিনেমা বলতে যা বোঝা যায় সেটি তো সাতচল্লিশ-উত্তর কোনো স্বতন্ত্র সিনেমা নয়। ভারত-পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পরেও যে উত্তরাধিকার এই দুই দেশের সিনেমাকেই বহন করতে হয়েছে তা হলো ভারতীয় সিনেমা। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে দেশ ভাগ হতে পারে, এক মুহূর্তে নিজের দেশ বিদেশ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু শিল্পসংস্কৃতি তো অনাত্মীয় হয়ে যেতে পারে না। যদিও পাকিস্তান সম্পূর্ণ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ায় জন্মের পরেই সেখানকার শিল্প সংস্কৃতির নানা প্রকাশের উপর বাধানিষেধ একটু বেশিই ছিল। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানেও একটা চাপ ছিল বাংলা ছবির বদলে পাকিস্তানি ছবি করার। উগ্র ধর্মীয় ফতোয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অ-ইসলামীয় বলে অস্বীকার করে তার বদলে মুসলমানি সংস্কৃতি আরোপ করার চেষ্টা ছিল, বুঝতে চাওয়া হয়নি সংস্কৃতিতে ধর্মের ভূমিকা থাকলেও ভাষা, আঞ্চলিক আচার ইত্যাদির ভূমিকা আরও বড়ো। এসব সত্ত্বেও পশ্চিম ও পূর্ব, দুই পাকিস্তানেই সিনেমায় ভারতীয় সিনেমার রাস্তা ধরে চলার প্রবণতা ছিল।

সাতচল্লিশের আগের ভারতীয় সিনেমার মানচিত্রে বাংলা সিনেমার একটা জায়গা ছিল, প্রধানত নিউ থিয়েটার্সের সুবাদে। যদিও তখনও ভারতীয় সিনেমা বলতেও প্রধানত মুম্বইয়ে তৈরি হিন্দি সিনেমাকেই বোঝান হতো। সেই সিনেমার ধারাই বয়েছিল পাকিস্তানের সিনেমাতেও, সেই পারিবারিক মেলোড্রামা, সেই পরিবারতন্ত্র। বাংলাদেশের সিনেমা কি এর ব্যতিক্রম হতে পারে!

বাংলাদেশের সিনেমা বলতে কোথা থেকে শুরু করা হবে? সাতচল্লিশের পর থেকেই তা একটি আলাদা দেশ, যদিও তখনই সে সার্বভৌম কোনো রাষ্ট্র নয়, পাকিস্তানেরই অঙ্গ। ফলে বাংলাদেশের সমস্যাটা একটু জটিল। ভারত থেকে সে পাকিস্তান হয়েছে, সেখান থেকে হয়েছে বাংলাদেশ। ফলে ভারতীয় সিনেমার ধারাকে একেবারে অস্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং পাকিস্তানি ছাপটা নানা কারণেই খুব একটা সেঁটে বসতে পারেনি তার গায়ে, তাই সেটা খুব একটা সমস্যা হয়নি। আসলে পূর্ব-পাকিস্তানের ছবি, পাকিস্তানি হওয়ার শর্ত সত্ত্বেও বাংলা ছবিই থাকতে চেয়েছিল; যদিও সেই বাঙালিয়ানা শিল্পগত ভাবে খুব যে গর্বোজ্জ্বল তা নয়। দেশভাগের পর মুম্বই থেকে বেশ কিছু সিনেমা জগতের লোক পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, তার ফলে সেখানকার সিনেমাকে একেবারে শূন্য থেকে শুরু করতে হয়নি। অবিভক্ত বাংলার ফিল্মজগৎ থেকে সেরকম কিছু ঘটেনি। ফলে সেখানে ফাঁকা থেকে শুরু করতে হয়েছিল। যদিও বিশ শতকের তৃতীয় দশকেই ঢাকার নবাব পরিবার 'সুকুমারী—দ্য গুড গার্ল' নামে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ও পরের দশকের শুরুতেই 'দ্য লাস্ট কিস' নামে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ফিল্ম তৈরি করেন। প্রযোজকরা তাঁদের কোম্পানির নাম

দিয়েছিলেন 'ঢাকা ইস্ট বেঙ্গল সিনেমাটোগ্রাফ সোসাইটি'। কিন্তু সে চেষ্টা আর বেশি এগোয়নি।

কিছুই যেখানে ছিল না, সেখানে শুরু করা কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। ১৯৪৬-এ কলকাতায় হিমাদ্রী চৌধুরী ছদ্মনামে বিশিষ্ট সাংবাদিক ওবায়েদ-উল হক 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন। এই প্রথম কোনও মুসলিম পরিচালক নির্মাণ করলেন একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র। এর পর ১৯৪৭-এ উদয়ন চৌধুরী ছদ্মনামে ইসমাইল মোহাম্মদ নির্মাণ করেন 'মানুষের ভগবান'। দেশভাগের পরে এঁরা ঢাকায় ফিরে আসেন এবং চলচ্চিত্র নির্মাণে নানা ভাবে উৎসাহ যোগাতে থাকেন। সাতচল্লিশের পর নুতন উদ্দীপনায় ভর করে, ঢাকাকে কেন্দ্র করে এক সাংস্কৃতিক জাগরণের চেষ্টা হয়েছিল; আব্বাসউদ্দীন আহমেদ শামসুল হুদা ইত্যাদিরা ফিল্ম প্রযোজনা ও স্টুডিও তৈরির চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনোটিই ফলবতী হয়নি। ১৯৪৮-এ জিন্নার পূর্ব-পাকিস্তান সফরের সময় রেডিও-ঘোষক নাজির আহমেদের উপর দায়িত্ব পড়ে একটি তথ্যচিত্র বানানোর, কলকাতার কলাকুশলীদের সহায়তায় তিনি নির্মাণ করেন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম তথ্যচিত্র 'In Our Midst' (1948)।

বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের পরের বছর, ১৯৫৩-তে জনসংযোগ বিভাগের অধীনে সরকারি প্রচারচিত্র নির্মাণের জন্য গঠিত হলো চলচ্চিত্র ইউনিট। ঢাকার তেজগাঁওতে স্টুডিও, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলো। ১৯৫৪ সালে এখান থেকে নাজির আহমদের পরিচালনায় নির্মিত হয় প্রামাণ্য চিত্র 'সালামত'। কিছুদিনের মধ্যেই তৈরি হলো 'কো-অপারেটিভ ফিল্ম-মেকার্স লিমিটেড', ১৯৫৪ সালে; সে বছরই জন্ম নেয় ইকবাল ফিল্মস। ইকবাল ফিল্মসের 'মুখ ও মুখোশ'-এর কাজ শুরু হয় সে বছরই, আবদুল জব্বর খানের পরিচালনায়। 'কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড'-এর উদ্যোগে ও সারাওর হোসেইন-এর পরিচালনায় শুরু হয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'আপ্যায়ন'। ১৯৫৫-তে তেজগাঁওতে স্টুডিও ও ল্যাবরেটরি হলো নাজির আহমেদের তত্ত্বাবধানে। 'মুখ ও মুখোশ' পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাক ফিল্ম। এর সম্পাদনা, প্রিন্ট তৈরি ও অন্যান্য কাজ হয়েছিল লাহোরে। আবদুল জব্বর খানের নিজের গল্প 'ডাকাত' থেকে তৈরি হয়েছিল এই ছবি। ছবিটি মুক্তি পেল ১৯৫৬ সালের ৩ অগাস্ট।

সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন, আট বছর লাগল পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব সিনেমা হতে। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো পূর্বপাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ইপিএফডিসি), তাদের সহায়তায় ১৯৫৯ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মিত ও প্রদর্শিত হতে লাগল নিয়মিত ভাবে। প্রথম দিকে পূর্বপাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ইপিএফডিসি) কয়েকজন নির্বাচিত পরিচালককেই সুযোগ দিত, সেই সুবাদেই চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার প্রথম ছবি 'আশিয়া' শুরু করেন ফতে লোহানী, একটি গ্রামকেন্দ্রিক কাহিনী নিয়ে। ১৯৬০ সালে এই ছবি মুক্তি পায়। তার আগেই ফতে লোহানীর দ্বিতীয় ফিল্ম 'আকাশ আর মাটি' মুক্তি পায় ১৯৫৯-এ, 'পূর্বপাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা'-র মাধ্যমে। সেটি ছিল সংগীতপ্রধান ফিল্ম। এই সময়ই মুক্তি পেয়েছিল মহিউদ্দিনের 'মাটির পাহাড়', এহতেশামের 'এদেশ তোমার আমার'। এছাড়াও তৈরি হয়েছিল উর্দু সিনেমা এ.জে. কারদারের 'জাগা হুয়া সাভেরা'। ছবিটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন'-এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়, পরিচালক অবশ্য

পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরের। ছবিটিও ছিল উর্দুতে, তবে এর ভিত্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পদ্মা নদীর মাঝি', অন্যতম প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তৃপ্তি মিত্র, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তিমির বরণ। সহকারী পরিচালক হিশেবে কারদার বেছে নিয়েছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত পরিচালক জহির রায়হানকে। ৮৭ মিনিটের এই ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংগীত রচনা করেছিলেন ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ। শুটিং হয়েছিল মানিকগঞ্জের কাছে মেঘনা নদী ও তীরবর্তী অঞ্চলে। ছবি মুক্তির তিনদিন আগে আয়ুব খান সরকার ছবিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অস্কারের জন্য পাঠানো হলেও সেখানে ছবিটি মনোনীত হয়নি, কিন্তু ১৯৫৯-এ মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই ফিল্মটি স্বর্ণপদক অর্জন করে। সম্প্রতি এই ফিল্মটি সম্পর্কে আবার সিনেমা-বিশেষজ্ঞরা উৎসাহ দেখাতে শুরু করেছেন। এসব সত্ত্বেও তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এই ছবিটির কোনো প্রভাব নেই।

একটা কথা মনে রাখা দরকার। ভারতীয় সিনেমা তার যাত্রা শুরু করেছিল কোনো পথরেখা না জেনেই, তার সামনে কোনো কিছু ছিল না। আর পূর্ব-পাকিস্তানের সিনেমার পিছনে ছিল ভারতীয় সিনেমার দীর্ঘ ঐতিহ্য, তা যেমনই হোক। অথচ তার দায় ছিল স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার। সেই সঙ্গে সিনেমার দায় ছিল জনগ্রাহ্য হওয়ারও। বক্স অফিসের সাফল্য আর শিল্পগুণান্বিত হয়ে ওঠা বেশির ভাগ সময়েই একসঙ্গে হয় না। পূর্ব-পাকিস্তানের ছবির সামনে শিল্পগুণান্বিত ছবির কোনো আদর্শও ছিল না, ভারতীয় সিনেমায় কিছুই সে পায়নি। দেশভাগের আগে শিল্প হয়ে উঠেছে এমন ভারতীয় ফিল্ম 'কল্পনা', আর অন্য ধরণের ছবি 'উদয়ের পথে'। 'জাগা হুয়া সাভেরা'-র আগেই যদিও রচিত হয়ে গেছে 'পথের পাঁচালী', কিন্তু সেদেশে এ ছবির অভিঘাত তখন পৌঁছয়নি। কাজেই যতই উৎসাহীরা দাবি করুন যে শুরুর বছরগুলিতেই পূর্ব-পাকিস্তানের সিনেমা নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও বেশ শিল্পমানোত্তীর্ণ ছিল তা একটু ছেলেমানুষি দাবিই। যখন কেউ কেউ বলেছেন শুদ্ধতার অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সে দেশের সিনেমা তখন তাকে আলংকারিক অতিশয়োক্তি ভাবাই ভালো। 'শুদ্ধতার অঙ্গীকার' শব্দগুচ্ছকে 'ভালো' বা 'খারাপ নয়' অর্থেই ধরতে হবে, তার বেশি কিছু নয়। উর্দু মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র 'জাগা হুয়া সাভেরা'-ই কিছুটা ব্যতিক্রমী বলে চিহ্নিত হতে পারে।

বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পর প্রথম এক দশকে তৈরি হয়েছিল সালাহ্উদ্দিনের 'যে নদী মরুপথে', 'সূর্যস্নান'। 'যে নদী মরুপথে'-তে সহকারি পরিচালক ছিলেন জহির রায়হান। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পরিচালক হিশেবেই আবির্ভূত হবেন, যদিও নিজের জায়গা খুঁজে পেতে তাঁকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৯৬০-এ মুক্তিপ্রাপ্ত এহতেশামের 'রাজধানীর বুকে' বেশ সাড়া জাগিয়েছিল, জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। অন্যদিকে ফতে লোহানির 'আশিয়া' ব্যবসায়িক সাফল্য না-পেলেও নানা পুরস্কার পেয়েছিল। গ্রামের জীবনকে ভিত্তি করে নির্মিত এই ফিল্ম অনেকটাই বাস্তবধর্মী, ফলে চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের কাছেও তা সাধুবাদ পায়। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে এটি পথের পাঁচালীর অনুকরণ, নিন্দা বা প্রশংসা যে অর্থেই হোক।

'জীবন থেকে নেয়া' জহির রায়হানের ফিল্ম, ১৯৭০-এ নির্মিত। এই ছবিটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। জহির রায়হানকে এই ফিল্ম এনে দিয়েছিল একজন সাহসী পরিচালকের সম্মান, আবার বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই ফিল্মের ভূমিকাও অপরিসীম।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পূর্বাভাস এই ছবি জুড়ে। রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বিরাগ ও আপত্তি সুপরিচিত, সেই সময়েই জহির এই ফিল্মে ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান 'আমার সোনার বাংলা', পরে যা স্বীকৃতি পাবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রূপে। 'জীবন থেকে নেয়া' ত্রুটিমুক্ত ফিল্ম নয়, শৈল্পিক বিচারে অনেক খুঁতই বেরোতে পারে, আবেগবাহুল্যও অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু কখনও কখনও শিল্প নানাবিধ ত্রুটি নিয়েও তার ভাবনার কারণেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'জীবন থেকে নেয়া'-র ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছিল। এই ছবিটি একটি ভাষার সঙ্গে যুক্ত মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করতে পেরেছিল পর্দায়, তাদের অনমনীয় দৃঢ়তাকে তুলে ধরতে পেরেছিল।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ, সময়ের বিচারে খুব বেশি নয়, মাত্র পঁচিশ বছর। এই অল্প সময়েই সেখানে যে বিপুল রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেল, চলচ্চিত্র সেই গতির সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টা করেনি। একটা কথা প্রথমেই মেনে নেওয়া ভালো, পৃথিবীর সব দেশে সব ভাষাতেই, যে-কোনো শিল্পমাধ্যমেই দুটি স্পষ্ট ভাগ দেখা যায়। একটি যথার্থ শিল্প, আরেকটি স্রেফ পণ্য। সাহিত্যে একদিকে রবীন্দ্রনাথ মানিক বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর সতীনাথরা, অন্যদিকে স্বপনকুমার শশধর দত্ত নিমাই ভট্টাচার্যরা। সিনেমার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি আরও বেশি চলে কেননা সিনেমা ব্যক্তিগত শিল্প নয়, নিজের লেখার টেবিলে বসে তা রচনা করা যায় না, প্রতি পদক্ষেপেই জড়িয়ে থাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগানের প্রশ্ন। স্বাভাবিক ভাবেই সেই অর্থ ফিরে পাওয়ার ইচ্ছাও থাকে অর্থ-বিনিয়োগকারীর। দ্বিতীয় কথাটি হলো পাঠক বা দর্শকের পছন্দের ব্যাপার। সব পাঠকই জীবনানন্দ পড়তে চাইবেন না, কেউ কেউ 'খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়লো'-তেই খুশি থাকবেন। কেউ অজস্রবার 'পথের পাঁচালী'-ই দেখবেন, কেউ বা বারবার দেখতে চাইবেন 'হারানো সুর' বা 'আওয়ারা'। সাহিত্য থাক, সিনেমায় কিন্তু 'হারানো সুর' বা 'আওয়ারা'-র দর্শকই 'পথের পাঁচালী'-র থেকে বেশি। দর্শকরুচি পাল্টানোর দায় প্রযোজকদের নয়, স্থিতাবস্থাতেই তাঁদের মুনাফা বাড়ার সুযোগ বেশি। এই সব কথা তুলতে হলো এক জায়গায় পৌঁছনোর জন্যই, পূর্ব-পাকিস্তানই হোক বা বাংলাদেশ, প্রকৃত শিল্পগুণান্বিত ছবির জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকদিন। মাঝে মাঝে দু-একটা ঝলক দেখা গেলেও তা আশা করার মতো কিছু নয়। কিছু ফিল্মে হঠাৎ হঠাৎ শুশুকের মতো মাথা তুলেছে শৈল্পিক কিছু মুহূর্ত, ব্যস ওইটুকুই।

দীর্ঘদিনই সেখানকার ফিল্ম নকলনবিশি করে চালিয়েছে। শুরুর দিকে পূর্ব-পাকিস্তানের ফিল্মের বিকাশের তাগিদে ভারতীয় সিনেমা নিষিদ্ধ ছিল সেখানে, পরিচালকদের তখন লড়তে হয়েছে আগেই আমদানীকৃত সুচিত্রা-উত্তমের ছবির স্মৃতির সঙ্গে। সেই লড়াইয়ে তাঁরা হলিউড বা ইওরোপীয় বা সোবিয়েৎ সিনেমার কাছে হাত পাতেননি। অন্য দুটি সম্ভব ছিল না চলচ্চিত্রবোধ পরিণত না হওয়ার কারণে, আর হলিউডকে যে তিতাস মেঘনা বা ধলেশ্বরীর পারে এনে বসানো যায় না; এটুকু কান্ডজ্ঞান অন্তত সিনেমা-করিয়েদের ছিল। ফলে তাদের সিনেমা আঁকড়ে ধরল নাচগান আর গ্রাম্য সংস্কারকে, জোলো কাহিনী বা লোককথার জন-সম্পৃক্ততার বদলে তা থেকে ছেঁকে নেওয়া আবেগকে, তাকে যতদূর তরল করে নেওয়া যায় তাই করে। বাংলাদেশ জন্মের আগে ভাষা-আন্দোলনের আবেগ বা জাতিসত্তার আত্মপরিচয়ের তাগিদ সিনেমায় খুব

একটা দেখা যায়নি, হয়ত সরকারি রোষের ভয়েই, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার পরেও একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ও দেশ গড়ে তোলার আবেগ যে খুব প্রতিফলিত হলো তা নয়। স্রোতের বাইরে সাঁতার কাটার লোক কমই ছিল, বেশির ভাগ সিনেমা পরিচালক মজে রইলেন পুরনো মদেই, তাও মুম্বই বা তামিল ছবির চোলাই।

বাংলাদেশে এখনও গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রভাব খুবই বেশি, নাগরিক সংস্কৃতির ছাপ আছে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারটির একটা সুস্থ দিক হলো সে দেশের সংস্কৃতি এখনও তার শিকড় হারিয়ে ফেলেনি, এখনও তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে জারি ভাটিয়ালি পীরের মাজার মনসা কীত্তনখোলা কর্ণফুলি পদ্মা। আবার সেই সঙ্গে তার ক্ষতিকারক দিক হলো আধুনিকতার সদর্থক দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা ধর্মীয় আধিপত্য ও নানা কুসংস্কার। চলতি স্রোত শেখায় এই ধর্মানুগত্য এই কুসংস্কারই সংস্কৃতি। স্রোতে গা ভাসান যে সিনেমাকর্মীরা তারাও তাই প্রতিফলিত করাতে চান তাদের কাজে, সরাসরি না হলেও পরোক্ষ ভাবে তো বটেই। ফলে গড়পড়তা বাংলাদেশী ফিল্ম গ্রামজীবনের ছবি দেখানোর নাম করে নষ্ট-হয়ে-যাওয়া পারিবারিক মূল্যবোধের জয়গান করে, অথবা অবাস্তব যাত্রা নির্মাণ করে সেলুলয়েডে। আর যে ছবি 'আধুনিক' হতে চায়, অর্থাৎ নাগরিকতার ভান করতে চায় তারা বেছে নেয় তামিল তেলেগু ছবির ধুমধাড়াক্কা অথবা মুম্বই ঘরানার ক্রাইম বা নাচগান, ভিলেনের গোঁফ-নাচানো হাসি, পিস্তল, নায়িকার অদ্ভুত দেহভঙ্গি। যেসব ছবি তৈরি হলো ১৯৭১-এর পর তারও পঁচানব্বই শতাংশতেই খুন, জখম, রাহাজানি, যৌনতা, নারী ধর্ষণ, নির্বোধ গোয়েন্দা এডভেঞ্চার ইত্যাদির ছড়াছড়ি। একটি পিছিয়ে থাকা দেশের প্রধান বাস্তবতার দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে কল্পলোক নির্মাণের চেষ্টা, তাতেও কল্পনা বা বুদ্ধি কোনো কিছুরই ছাপ নেই। যেদেশে নানা কুসংস্কারের ছড়াছড়ি সেদেশের ফিল্মে সেই কুসংস্কারকে সমালোচনা করার বদলে তাকে মহিমান্বিত করার চেষ্টাও দেখা যায়।

ষাটের দশক কিন্তু বাংলাদেশে খুব উল্লেখযোগ্য সময়। ১৯৬২-তে শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৪-তে একদিকে দাঙ্গা আরেক দিকে দাঙ্গা বিরোধী উদ্যোগ, ১৯৬৬-এর ৬ দফা, ৬৯-এ জনগণের ধূমায়িত রোষের তীব্র ফেটে-পড়া— সব মিলিয়ে ষাটের দশক পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালির ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায়। শিল্পসংস্কৃতিতে তার চাপ ভালোভাবেই অনুভূত হওয়ার কথা। সেসময় যাঁরা সিনেমা করছিলেন, নাজির আহমেদ, সুভাষ দত্ত, ফতেহ লোহানী, সাদেক খান, খান আতাউর রহমান, জহির রায়হান, তাঁরাও কেউ হেঁজিপেঁজি লোক ছিলেন না। তবু ১৯৫৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যেসব ছবি তৈরি হলো, তার আঙুলে গোনা দু-একটি ছাড়া সার্থক সিনেমা খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্বৈরশাসনের মোকাবিলা করার মানসিক প্রস্তুতি হয়ত তাঁদের তখন ছিল না, তাই তাঁরা ছবিতে সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার সামনে দাঁড়াতে চাননি। কিন্তু ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মতো একটা বিশাল ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও, সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জনের ডাক সত্ত্বেও, সেই ডাকের পরিণতিতে নানা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আন্দোলন ও শেষে মুক্তিযুদ্ধ, তবু এইসব মানুষ সিনেমায় থাকা সত্ত্বেও সিনেমা-কর্মীদের এসব ভাবনা তেমন উজ্জীবিত করতে পারল না, এটা একটু বিস্ময়কর। এর মাঝেই যে কয়েকটি ছবির কথা মনে রাখা যায় তার অনেকগুলোরই নির্মাতা জহির রায়হান।

কাহিনীচিত্র নয়, বরং তথ্যচিত্র তৈরি হচ্ছিল অবাস্তবতার মায়াজাল সরিয়ে। ১৯৭১-এই নির্মিত হয় জহির রায়হানের 'স্টপ জেনোসাইড'। কুড়ি মিনিটের এই ফিল্মটি মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়েই নির্মিত হচ্ছিল। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের কাজকর্মের কিছু পরিচয় থাকলেও এই ছবির মূল বৈশিষ্ট্য হলো পাকিস্তানি বাহিনীর গণ্যহত্যা ও তার রাজনীতিকে বুঝতে চাওয়া। একটি আক্রান্ত দেশের যন্ত্রণা এখানে রূপ পেয়েছে, জহির সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন সেই হত্যা সেই বেদনার দেশকালের সীমাতিক্রমী চেহারাটিও। লেনিনের একটি উদ্ধৃতি শুরুতেই ব্যবহৃত, তারপর ঢেঁকিতে ধানভানার শব্দ আর সেই শব্দকে ছাপিয়ে ভেসে আসে মেশিনগানের শব্দ, এই সূচনার সঙ্গে মিশে যায় রাস্তায় পড়ে-থাকা বা জলে ভেসে-আসা একটি লাশ বা লাশের সারি, মৃতদেহ, বুলেটবিদ্ধ শরীর, ফেটে যাওয়া মাথার খুলি, চোখ উপড়ে নেওয়া মানুষ — এইসব স্থিরচিত্র পেরিয়ে পৌঁছতে হয় চলমান দৃশ্যে। পর্দায় ভেসে ওঠে স্টপ জেনোসাউড, ২০ জুলাই টেলিপ্রিন্টারে আসা তিনটি খবর —প্রথমে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে উত্থাপিত মানবাধিকারের বাণী, তারপরেই ভিয়েতনাম, স্থির চিত্র—বি ৫২ বোমারু বিমানের ধ্বংসযজ্ঞ, মার্কিনি ও তার তাঁবেদার বাহিনির অত্যাচার, শিশুদের মৃতদেহ। তৃতীয় খবর বাংলাদেশের শরণার্থী মিছিল। পাক হানাদারদের নৃশংসতার বর্ণনা আসে সাউন্ড ট্রাকে, সঙ্গে গণহত্যার স্টিল। ইয়াহিয়া, তৈমুর, চেঙ্গিস, হিটলার মুসোলিনি এক সমতলে এসে যায়। আবার খবর আসে টেলিপ্রিন্টারে। ভিয়েতনামের যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষ নিয়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ওকালতির খবর আসে, ভিয়েতনামের গণহত্যার স্টিল, কাট টু বুড়িগঙ্গা, বাংলাদেশের গ্রাম, পুড়ে যাওয়া জনপদ, লাশের সারি। আবার শরণার্থী মিছিল। জাতিসংঘের মানবাধিকারের মহান বাণী, ছবির ফ্রেম জুড়ে বন্দুকের নল, গুলির শব্দ। তার পরেও ছবি দেখায় প্রতিরোধ, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রস্তুতি আর যুদ্ধ। বাংলাদেশের সঙ্গে মিশে যায়, ভিয়েতনামের, হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা। ফরাসি বিপ্লব, হিটলারের জার্মানি, আলজিয়ার্সের রাজপথ— শেষে গণহত্যার অবসানের আহ্বান। এই হলো জহির রায়হানের 'স্টপ জেনোসাইড।'

এই ছবিতে আলমগীর কবীরের কণ্ঠস্বর ব্যবহৃত হয়েছিল। আলমগীর নিজেও করেছিলেন 'লিবারেশন ফাইটার্স' ও 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' নামে দুটি তথ্যচিত্র। এছাড়াও তৈরি হয়েছিল বাবুল চৌধুরির 'ইনোসেন্ট মিলিয়ন্স'। এসব হলো মুক্তিযুদ্ধ ও তার অব্যবহিত পরের কথা। স্বাধীনতার পরেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত হয়েছিল চাষী নজরুল ইসলামের 'ওরা এগারো জন', আর সুভাষ দত্তর 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী, ১৯৭২-এ। প্রথমটিতে মুক্তিযুদ্ধের সেনানীদের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের চিত্রায়ণ, দ্বিতীয়টিতে এক অভিনেতার অভিজ্ঞতায় বিধৃত পাকবাহিনীর আক্রমণ, গ্রাম জুড়ে ধ্বংসলীলা, লড়াই ও স্বাধীনতা অর্জনের কাহিনী। ১৯৭৩-এ নির্মিত আলমগীর কবীরের 'ধীরে বহে মেঘনা', হারুনর রশিদের 'মেঘের অনেক রং'-ও মুক্তিযুদ্ধেরই কাহিনী। 'ধীরে বহে মেঘনা' আলমগীর কবীরের প্রথম কাহিনীচিত্র। 'ধীরে বহে মেঘনা' চলচ্চিত্র-কৌশলের দিক থেকে খুবই স্বতন্ত্র। এর মূল ব্যাপার মুক্তিযুদ্ধ হলেও তা এসেছে ফ্ল্যাশব্যাকে, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী দেশের অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে ফিল্মে। আলমগীর সেখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন ও অন্তর্লীন রাজনীতিকেও এনেছেন। ১৯৭৫-এ তৈরি হলো আলমগীর কবীরের দ্বিতীয় ফিল্ম 'সূর্য কন্যা'। সমাজ

ও ইতিহাসে নারীর জায়গা কোথায় সেটাই দেখাতে চেয়েছিলেন কবীর এই ফিল্মে। ১৯৭৭-এ সালে নির্মাণ করলেন তাঁর তৃতীয় চলচ্চিত্র 'সীমানা পেরিয়ে', ১৯৭০-এর ভয়াবহ বন্যার একটি সত্যি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এরপর ১৯৭৯ সালে 'রূপালী সৈকতে', তারপর ১৯৮২ সালে 'মোহনা'। ১৯৮৪ সালে তৈরি হলো 'পরিণীতা', ১৯৮৫ সালে তাঁর সপ্তম ও সর্বশেষ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মহানায়ক। স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুর সেই দিনগুলি থেকেই সিনেমার অসীম শক্তিকে অনুধাবন তাকে বোধির বিষয় করে তুলতে চেয়েছিলেন আলমগীর কবীর। একদা ছিলেন জহির রায়হানের সহকারি। তাঁর ফিল্ম যে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত তা নয়, তিনি নিজেও তা মনে করতেন না। অজস্র পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁর সব ছবিই প্রায় পুরস্কার-ধন্য, কিন্তু তা দিয়ে তাঁকে বিচার করা যায় না। বাংলাদেশের ফিল্মরুচিকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন আলমগীর কবীর। চিত্রপরিচালক তানভীর মোকাম্মেল আলমগীর কবিরকে বাংলাদেশের প্রথম অঁতর পরিচালক ও 'ধীরে বহে মেঘনা'-কে পুরোপুরি অঁতর সিনেমা বলে অভিহিত করেছিলেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম দশকে উল্লেখযোগ্য ফিল্ম হলো 'সূর্যদীঘল বাড়ি', ১৯৭৯-র ফিল্ম, যুগ্ম পরিচালক মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী। আবু ইসহাক এর ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত হয়েছিল। জয়গুন এই ফিল্মের প্রধান চরিত্র, আকালের বছরগুলিতে গ্রাম ছেড়ে গিয়ে শহরের লঙরখানায় কোনোরকমে খাবার জোটাতে পেরেছিল সে। সে স্বামী-পরিত্যক্তা, কিন্তু তাকে বইতে হয় মৃত প্রথম স্বামীর ছেলে ও দ্বিতীয় স্বামীর মেয়ে, ও মৃত ভাইয়ের স্ত্রী-পুত্রকে। গ্রামে ফিরে এসে অপয়া ভিটে বলে পরিচিত এক টুকরো জমিতে ঘর বানায় তারা। দুর্গতি শেষ হয় না। জীবনসংগ্রামে বিধ্বস্ত জয়গুনের দিকে নজর পড়ে গাঁয়ের মোড়লের। আবার দ্বিতীয় স্বামীও ঘরে ফিরিয়ে নিতে চায় তাকে। জয়গুন কারো কথাতেই রাজি হয় না। কিন্তু সে তো ভোগ্য সামগ্রী মাত্র। ফকির বা মোড়লের লালসা, ধর্মীয় মাতব্বর ও গ্রামসমাজের নানা বিধান—এই সবের মোকাবিলা করতে হয় জয়গুনকে। দুই প্রতিযোগীর সাক্ষাৎ হয়, মোড়ল খুন করে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। জয়গুন ঘটনার দর্শক, সেই দেখে ফেলার ফলে মোড়ল তার ঘরে আগুন লাগায়, আবার তাদের ঘরছাড়া হয়ে রাস্তায় নামতে হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছিল এই ফিল্মটি। সস্তা জনপ্রিয়তার রাস্তা ছেড়ে কিছু আকাঁড়া বাস্তবকে তুলে ধরতে পেরেছিল এই ফিল্ম; কুসংস্কার, সামাজিক নানা বাধা, সবলের প্রতিপত্তি আর পুরুষতান্ত্রিকতার চাপে পর্যুদস্ত হওয়া সাধারণ মানুষের জীবনই উঠে এসেছিল এই ফিল্মে। কিন্তু ছবিটির একটা বড়ো ত্রুটি হলো এর বিপুল দৈর্ঘ্য আর শ্লথ গতি।

দু-একটি প্রয়াস বাদ দিলে সিনেমা সত্যি সত্যি যে শিল্প হয়ে উঠতে পারে, বাংলাদেশের সিনেমাকে তার প্রমাণ পেতে অপেক্ষা করতে হলো বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশী পরিচয়ে যে নানা জটিলতা লুকিয়ে থাকে তার একটা সমাধানে বোধ হয় পৌঁছনো গেল দু দশক পেরিয়ে। এর আগে আশির দশকের প্রথমেই মোরশেদুল ইসলাম নির্মাণ করেছিলেন তাঁর প্রথম ছবি 'আগামী'। এই ছবিটিকে আখ্যাত করা যায় বাংলাদেশ ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ফসল হিশেবে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও মুক্তিযোদ্ধাদের যে অবহেলার

শিকার হতে হয়েছিল, গ্রামাঞ্চলে থেকে গিয়েছিল রাজাকারদের দাপট, সেই সব সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল এই ছবিতে। যদিও ছবি শেষ হয় আগামীদিনের আশা নিয়েই। সেই বছরেই এসেছিল তানভীর মোকাম্মেলের 'হুলিয়া'। নির্মলেন্দু গুণের একটি কবিতা অবলম্বনে ফিল্ম তৈরি করার এই ভাবনাও বাংলাদেশের সিনেমাশিল্পে অভিনব, বিশেষত যে কবিতা আদ্যন্ত রাজনৈতিক। আশির দশকেই তারেক মাসুদ একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন 'সোনার বেড়ি'। বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা নিয়ে নির্মিত এই ছবিটি এমন কিছু না হলেও এর নামকরণটি লক্ষ করার মতো। এই দশকের শেষের দিকে তিনি নির্মাণ করেন চিত্রশিল্পী এম এস সুলতানকে নিয়ে তাঁর প্রামাণ্যচিত্র 'আদম সুরত'। লোকশিল্পের প্রাণস্পন্দনকে অনুভব করা যায় এই ফিল্মে, অনুভব করা যায় এম এস সুলতানের কাজের গভীরতাকে। নব্বইয়ের দশকে এসে এই মোরশেদুল ইসলাম তানভীর মোকাম্মেল তারেক মাসুদরাই বাংলাদেশের সিনেমার উজ্জ্বলতম মুখ হয়ে দাঁড়ালেন। স্বভাবতই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে তাদের একটা মানসিক দূরত্বও তৈরি হলো।

ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ম বলতে যা বোঝে, যাকে অভিহিত করা হয় মূলধারার ছবি বলে, তা দিয়ে বাণিজ্য কতটা হয় সেটি তর্কসাপেক্ষ, তবে তার মুখ্য উদ্দেশ্য আর্ট নয়, বক্স-অফিস সাফল্য। বাংলাদেশের সিনেমা তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা, তার পরের প্রায় অর্ধশতক ধরে বাংলাদেশের এই তথাকথিত মূলধারার সিনেমা কী উপহার দিয়েছে দর্শককে? ৭০-এর দশকে বাংলাদেশের ফিল্মের মান যেমনই হোক তা অন্তত মৌলিকতার দাবি করতে পারত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কিছু ছবিতে ছিল, বাকিগুলি অন্তত ঘরোয়া গল্প নিয়ে বা গ্রাম্য পারিবারিকতা কেন্দ্র করে তৈরি হতো। ৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে বাংলাদেশী ফিল্মে শুরু হলো নকলনবিশির জোয়ার। প্রতিবেশী ভারত থেকে সোজা পথে ফিল্ম আসার উপায় ছিল না, কিন্তু প্রযোজক পরিচালকরা খুঁজে বার করতেন মুম্বই বা তামিল তেলেগু ছবি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে বছরে বড়জোর তিনচারটি মৌলিক ছবি, বাকি সবই হিন্দি, তেলেগু বা তামিল সিনেমার নকল। কেবল কাহিনী নয়, গান, পোস্টারও। সিকোয়েন্স-এর পর সিকোয়েন্স টুকে দেওয়াও দেখা গেছে। সিনেমার পোস্টারও মুম্বই সিনেমার নকল, যাকে নকল না বলে চুরি বলাই যায়; মুম্বই নায়কের পোস্টারে সুপার ইম্পোজ করে বাংলাদেশের নায়কের মুখ বসিয়ে দিয়ে পোস্টার তৈরি হয়েছে। তামিল তেলেগু ফিল্মের অবাস্তব অতি-নাটকীয় প্রায়-অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন নায়কের কীর্তিকলাপ নকল হচ্ছিল বাংলাদেশী সিনেমায়। বাংলা সাহিত্যের বিপুল ভান্ডারকে উপেক্ষা করে শিকড়হীন হতে চেয়েছিলেন কেন বাংলাদেশের সিনেমা—নির্মাতারা, তার কারণ অবশ্য স্পষ্ট। ভেবেছিলেন এতেই কাউন্টারের ক্যাশবাক্স উপচে পড়বে। খেয়াল করেননি তারা যে তামিল তেলেগু সিনেমা আর বাংলা সিনেমার ঐতিহ্যই আলাদা। আর ধার করেও নিজেদের চিন্তার দৈন্য ঢাকা যায় না।

৯০ দশকের বাংলাদেশী সিনেমায় এই নকলেরই রাজত্ব। সেই সঙ্গে বাঙালি মধ্যশ্রেণির রুচিকে বিপর্যস্ত করে, গ্রামীণ বাংলার সাধারণ ধর্মভীরু মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধকে তালগোল পাকিয়ে শুরু হলো অসুস্থ রুচির ছবি নির্মাণ, যাকে আধুনিকতা বা ইউরোপ আমেরিকার প্রভাব ইত্যাদি কোনো দোহাই দিয়েই সমর্থন করা যায় না।

এছাড়াও আরেকটি গোলমেলে ধারণাও কাজ করে। কাকে বলে ভালো সিনেমা?

বাংলাদেশের, হয়ত সর্বত্রই, প্রযোজকদের বেশির ভাগই মনে করেন ভালো সিনেমা হলো তাই যে ছবি দর্শক টানে। সেজন্যই তারা মনে করেন নাচ গান ছবিতে থাকতেই হবে। যদিও এটা অন্তত তারা মুখে বলেন যে ভালো গল্পও থাকা দরকার। সমস্যা হলো ভালো গল্প থাকলেও ভালো সিনেমা হয় না, সেজন্য গল্পটাকে সিনেমা করে তুলতে হয়। বাংলাদেশের তথাকথিত 'মূলধারার সিনেমা'-য় সেই গল্পটা সিনেমার ভাষায় বলতে পারেন না অধিকাংশ নির্মাতাই। কেবল বিনোদনের কথা মাথায় রেখে যে ছবি, তার জন্য সিনেমা-নির্মাতারা ভরসা রাখেন নাচ গান আর ঝাড়পিটের উপরই, কিন্তু সেখানেও মধ্যমানের পরিচয়ই বেশি। ফলে বিনোদন সুস্থও হচ্ছে না, দক্ষও হচ্ছে না। গতানুগতিককেও ঠিক মতো পরিবেশন করতে হয়--বিচিত্র আলখেল্লা-পরা ভিলেন, চিৎকার করে যাত্রার মতো সংলাপ অথবা উদ্ভট উৎকট নাচ আর হাস্যকর মারামারি, এতে বাণিজ্যও হয় না। এর সঙ্গে আবার ছিল সমাজসচেতন বা বাস্তববাদী হওয়ার ভান করা কিছু ছবি, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'গোলাপী এখন ট্রেনে।

এর মাঝেই সৎ সিনেমার সন্ধান দিলেন অন্যরা। তারেক মাসুদ তানভীর মোকাম্মেল মোরশেদুল ইসলামরা। বস্তুত তারেক তানভীর মোরশেদুলদের প্রত্যেকের কাজ নিয়ে প্রবন্ধ নয়, একেকটা গোটা বইই লিখে ফেলা যায়, তাদের এক-একটি ছবি নিয়ে লেখা যায় আলাদা আলাদা প্রবন্ধ। আছেন শামীম আখতার। শামীম আখতারের 'ইতিহাসকন্যা' আপাতভাবে ব্যক্তির সংকটের ছবি। কিন্তু ব্যক্তি তো সমাজবিচ্ছিন্ন নয়, ইতিহাসবিচ্ছিন্নও নয়। বাস্তবের মধ্যে তার বসবাস, ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠা যেমন ব্যক্তির অস্তিত্বেরই সার্থকতা, তেমনই তা বোধহয় এক বিপুল যন্ত্রণাও। আর সে ইতিহাস যদি হয় মুক্তিযুদ্ধের তবে তা পাওয়া ও হারানোরও বটে। শামীম সেই পাওয়া আর হারানোকে ধরতে পারেন তাঁর 'ইতিহাসকন্যা'-য়। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ফিল্ম হলো 'শিলালিপি'।

তারেক মাসুদ প্রথমে তথ্যচিত্র নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, যদিও তাঁর তথ্যচিত্র নীরস তথ্যে ভারাক্রান্ত ছিল না কখনও। 'আদম সুরত'-এর পরে নব্বইয়ের দশকে তিনি করলেন 'মুক্তির গান' ও 'মুক্তির কথা', মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত এই তথ্যচিত্রদুটি মেজাজে ও ভাবনায় একেবারেই স্বতন্ত্র। লিয়ার লেভিনের ক্যামেরায় বন্দী ফুটেজ কাজে লাগিয়েই 'মুক্তির গান' নির্মিত, যদিও তারেক ও ক্যাথেরিন তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। ভ্রাম্যমান সংগীতশিল্পীদের দলটিকে কেন্দ্র করে পরিচালকই যেন মুক্তিযুদ্ধের অংশীদার হয়ে ওঠেন। তারেক বলেছিলেন তিনি ট্র্যাডিশনাল ইতিহাসের ভন্ডামি থেকে বেরিয়ে আসতে চান। তারপর নির্মিত হয় 'মুক্তির কথা'। তারেক মাসুদ অবশ্য কাহিনীচিত্র বেশি করার সুযোগই পাননি, অতর্কিতে মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছে। যেটুকু করেছেন তিনি তার মধ্যে আছে 'মাটির ময়না'। 'মাটির ময়না'-তে এসে তারেক মাসুদ বাংলাদেশের সিনেমাকে শিল্প ও অন্তর্লীন রাজনীতির সম্মিলনে পৌঁছে দিতে পারলেন। সমাজবাস্তবতাকে এত নিবিড় ভাবে অনুধাবন বাংলাদেশের সিনেমায় খুব কমই হয়েছে এর আগে। পাশ্চাত্ত্য চালচলন থেকে গোঁড়া মুসলমান বনে-যাওয়া কাজী সাহেব আর মাদ্রাসায় পড়তে পাঠানো আনুর জীবন যে অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়ায় তার জন্য তারা কেউই প্রস্তুত ছিল না। ধর্ম প্রথা আচার রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ সবকিছুই আছে এই ফিল্মে, কিন্তু নেই কোনো বাণী প্রচার, সব মিলিয়ে এক মানবিক দলিল হয়ে ওঠে এই ফিল্ম। এর পরে তারেক মাসুদ নির্মাণ করেছিলেন 'রানওয়ে'। তথ্যচিত্র ও কাহিনীচিত্র মিলিয়ে

বাংলাদেশে ভালো সিনেমার নূতন পথ তৈরিতে এক অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তারেক মাসুদ, তাঁর দুর্ঘটনায় অকালমৃত্যু কেবল বাংলাদেশের নয়, বিশ্বচলচ্চিত্রের পক্ষেই এক বিরাট ক্ষতি।

তানভীর মোকাম্মেল তথ্যচিত্র ও কাহিনীচিত্র, দুটি স্বাতন্ত্র্যেই দীপ্যমান। বস্তুত তিনি নিয়ম করেই একটি কাহিনীচিত্র তারপর তথ্যচিত্র তারপর আবার কাহিনীচিত্র, এইভাবে ছবি তৈরি করে যান। তাঁর তথ্যচিত্রের বিষয় বিচিত্র এবং প্রথাবিরোধী, সাহসীও বটে। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-পরবর্তী অধ্যায়ে যে বিহারীরা সংগত কারণেই বাংলাদেশে ঘৃণার পাত্র, তাদের নিয়েই মানবিক দলিলচিত্র 'স্বপ্নভূমি', তেমনই 'কর্ণফুলির কান্না'-র বিষয় হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের লাঞ্ছিত প্রকৃতি ও আদিবাসী মানুষদের লাঞ্ছিত জীবন। 'বস্ত্রবালিকারা' বাংলাদেশের গারমেন্ট-শিল্পে কর্মরত অসংখ্য নারীশ্রমিকের কথা। উপেক্ষিত জননায়ক তাজউদ্দীন আহমেদকে নিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন 'নিঃসঙ্গ সারথি'। কিন্তু তানভীরের অসামান্য কাজ হলো মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত প্রায় পৌণে চারঘন্টার তথ্যচিত্র '১৯৭১'। ইতিহাসকে কেবল তথ্যেই ধরেননি তিনি, তার মর্মবস্তুকেও দর্শকের মনে সঞ্চারিত করে দেন। তেমনই আরেকটি তথ্যচিত্র 'সীমান্তরেখা', ১৯৪৭-এর পর থেকে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত চলে আসা উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রামের এক বস্তুনিষ্ঠ মানবিক দলিল এটি।

এর পাশাপাশি তানভীর করেছেন 'নদীর নাম মধুমতী', 'রাবেয়া', 'চিত্রা নদীর পারে', 'লালন', 'লাল সালু' ও 'জীবনঢুলী'। 'নদীর নাম মধুমতী' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত, তানভীরের আগ্রহ সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কাহিনীর দিকে। কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, ব্যক্তিকে তিনি সমাজ ও বৃহত্তর পরিধির অংশ হিশেবেই দেখতে চেয়েছেন। 'চিত্রা নদীর পারে' বা 'রাবেয়া' বা 'জীবনঢুলী' যেমন তুলে ধরে পূর্বপাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার কথা বা চিত্রিত করে মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারদের নোংরা ভূমিকা তেমনি 'লাল শালু'-তে তিনি অনায়াসে তুলে ধরেন একটি দারিদ্রপীড়িত ও সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ সমাজে ধর্মব্যবসার স্বরূপ। আবার 'লালন'-এ চিত্রিত হয় উনিশ শতকের এক স্বশিক্ষিত মানবতাবাদীর জীবন, কেবল ইতিহাসকে জানার অভিপ্রায়ে নয়, তাঁর জীবনবোধকেও আলোকিত করার জন্যও।

থিয়েটারের অভিজ্ঞতা নিয়ে সিনেমায় এসেছিলেন মোরশেদুল ইসলাম, শুরু করেছিলেন স্বল্প দৈর্ঘের ফিল্ম 'আগামী' দিয়ে। বাংলাদেশের পরবর্তী সময়ের ভালো সিনেমার রাস্তা খুলে দিয়েছিল এই ছবিটি। কিন্তু সেলিম আলদীনের নাটক অবলম্বনে তাঁর 'চাকা' প্রবল ধাক্কা লাগাল বাংলাদেশের সিনেমায়। এক অপঘাতে মৃত মানুষের লাশ নিয়ে এ দরজা থেকে ও দরজা ঘুরতে হচ্ছে, কিন্তু কেউ এই লাশের দায়িত্ব নিতে চাইছে না—আপাতভাবে অ্যাবসার্ড এই কাহিনীকেই মোরশেদুল করে তোলেন এক বিপুল জীবনজিজ্ঞাসার আখ্যান। 'দুখাই'-তে উঠে আসে বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের জীবন, 'খেলাঘর'-এ একটি মেয়ের অভিজ্ঞতার আলোয় ধরা পড়ে মুক্তিযুদ্ধের নির্মম ক্ষত। যুদ্ধ নেই কিন্তু যুদ্ধের যন্ত্রণাকে প্রতিমুহূর্তে তীব্রভাবে অনুভব করায় এই ফিল্ম। 'আমার বন্ধু রাশেদ'-ও মুক্তিযুদ্ধের ছবি, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া কিশোরদের নিয়ে রচিত এই ফিল্ম।

একসময়ে 'রূপবান'-এর মতো লোককথা-নির্ভর ফিল্মেই ছিল বাংলাদেশের ফিল্মের যাবতীয় মনোযোগ, তাকে বলা যায় ফটোগ্রাফ্ড যাত্রা মাত্র। সিনেমা নিয়ে আদৌ ভাবতেন না সেই সব ফিল্মের রচয়িতারা। তার পরে বা পাশাপাশি এল নাচগানঘুষোঘুষিতে ভরা তামিল তেলেগু ছবি থেকে টুকে দেওয়া ফিল্ম। দর্শক দেখতেন এই সব ছবিই, বলা ভালো এই রকম ছবিই তাদের গিলতে বাধ্য করা হতো। কিন্তু অতৃপ্তি ছিল তাঁদের যাঁরা সিনেমাকে সত্যিই শিল্প মনে করেন; অতৃপ্তি ছিল দর্শকেরও। কিন্তু সিনেমা যাদের কাছে পণ্যমাত্র সেই দুষ্টচক্রের জাল কেটে বেরনোটা সহজ ছিল না। বিকল্প ধারায়, স্বল্প দৈর্ঘের ছবি করে অচলায়তন ভাঙার চেষ্টা শুরু হয়েছিল আশির দশকে, নব্বইয়ের দশকে সেই চেষ্টা বেগবতী হয়ে উঠল। আজ তাই বাংলাদেশে সম্ভব হয়েছে তথাকথিত মূলধারার বাইরে বেরিয়ে এক সমান্তরাল ভালো ছবির জগৎ নির্মাণ। সব ফিল্মই ধ্রুপদী মানে পৌঁছয় না, কিন্তু ভালো ছবি সৎ ছবির একটা ধারা তৈরি হয়েছে, আজ আর 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' দেখিয়ে বলা যাবে না বাংলাদেশে তো কেবল এরকম ছবি হয়। এখন সেখানে আছেন নিশাত জাহান রানা, ফৌজিয়া খান বা আরও কেউ, যাঁরা তথ্যচিত্রে ধরে রাখতে চাইছেন সমাজকে ইতিহাসকে, তার বদলকে, প্রবহমানতাকে। আছেন নাসিরুদ্দীন ইউসুফ, কাজি মোরশেদ, এনামুল করিম নির্ঝর, আবু সাইয়ীদ বা এরকম আরও কয়েকজন, যাঁরা ছক ভেঙে অন্য পথে হাঁটতে চান, কাহিনীচিত্রকে কেবল বিনোদনের মাধ্যম মনে করেন না, তাকে মননের খোরাক করে তুলতে চান।

ঋত্বিক ঘটক বাংলাদেশে নির্মাণ করেছিলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম'। কিন্তু ঋত্বিকের ছবিকে বাংলাদেশের ফিল্ম বলে বিবেচনা করার অসুবিধা হলো দুটি। প্রথমত তা সম্পূর্ণভাবেই ঋত্বিকেরই ফিল্ম, কোনো ভৌগোলিক চিহ্ন দিয়ে তাকে সীমায়িত করা চলে না। দ্বিতীয়ত এই ফিল্মটি এক নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রম, বাংলাদেশের ফিল্মের ধারার সঙ্গে তাকে মেলানো কঠিন। যাঁরা অন্যভাবে ফিল্ম করতে চাইছেন তাঁরা শিল্পের এক ভিন্নতর ভূমিকা নির্মাণ করতে চান—ভিন্নতর অবশ্য বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বিচারে, না হলে এ কাজ সারা দুনিয়ায় শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে অনেকেই করেছেন। কিন্তু সিনেমার ভাষা যতই আন্তর্জাতিক হোক, নির্মাতাকে সে ভাষায় পৌঁছতে হয় নিজের জায়গা থেকে। সেই জায়গাটা অনুকূল না থাকলে তাঁদের কাজটা কঠিন হয়ে ওঠে। নিজেকে আলাদা করে নিতে পারা, নিছক বিনোদনের জায়গা থেকে সিনেমাকে সরিয়ে আনতে পারা এক নান্দনিক ও বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুশীলনের স্তরে—কাজটা খুব সহজ নয়। সেই কঠিন কাজটা বাংলাদেশের সিনেমায় শুরু হয়েছে অনেক বাধা পেরিয়ে, এটা আশার কথা।